সাঁওতালি ভাষা: উৎস ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ*

Approximately three lakh Santali inhabit the northern region of Bangladesh (NB), namely, Rajshahi, Nawgaon, Dinajpur, Bogura, Rangpur, Thakurgaon etc. In terms of the Santali language there are 52 lakh speakers in the world, concentrated primarily in the region if India, Bangladesh and Nepal. Devoid of a script of its own the Santali language has been handed down generation after generation orally. However, the first written forms of Santali can be found in the Roman script, written by the Christian missionaries. However, the Bangla script was used for Santali education. The Santali language belongs to the Mundari branch of the Austro-Asiatic language family. Although there have been sparse attempts to study the language of the Santals, no research work on the origin and linguistic features of Santali can be found in Bangladesh. This article discusses the origin of Santali and presents a linguistic analysis of its characteristic features.

সাঁওতালি ভাষা: ভূমিকা

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অর্থাৎ রাজশাহী, নওগাঁ, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর, ঠাকুরগাঁ প্রভৃতি জেলায় প্রায় তিন লক্ষ সাঁওতাল(আদিবাসী জাতি) বসবাস করে। তবে ভারত, বাংলাদেশ এবং নেপাল মিলিয়ে পৃথিবীতে ৫২ লক্ষ লোক সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে। হাজার হাজার বছর ধরে বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসা এই সাঁওতালি (সাঁন্তালি) ভাষার কোন নিজস্ব বর্ণমালা নেই। তবে খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতে সর্বপ্রথম সাঁওতালি ভাষার লিখিত রূপ দেওয়া হয় রোমান হরফে। ১৮৬৯ সালে ভারতের সাঁওতাল পরগনার লুথারিয়ান মিশনে স্থাপিত একটি ছাপাখানা থেকে প্রথম সাঁওতাল ভাষার ব্যাকরণ ও অন্যান্য বই প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে রঘুনাথ মুর্মু 'অলচিকি' নামে সাঁওতালি বর্ণমালা তৈরি করে এবং তা সেখানে সরকারি স্বীকৃতিও লাভ করে। বাংলাদেশে জাতীয় আদিবাসী পরিষদের উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে রাজশাহী জেলায় (বর্ষাপাড়া গ্রামে) সাঁওতালি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে মূলত বাংলা হরফেই সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে তৈরি গ্রন্থের নাম 'পাহেল পুথি'। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত দেশী শব্দগুলো প্রধানত সাঁওতালি ও মুন্ডা ভাষা থেকে আগত। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবারের মুন্ডারি শাখাভূক্ত ভাষা হচ্ছে– সাঁওতালি। এ প্রবন্ধে মূলত সাঁওতালি ভাষার উৎস ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

বাংলাদেশের আদিবাসীদের বিশেষ করে সাঁওতালদের ভাষা বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কাজ হলেও এই ভাষার উদ্ভব ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো গবেষণা হয়নি। আর সে লক্ষে সাঁওতালি ভাষা: উদ্ভব ও ভাষাবৈশিষ্ট্য বিষয়ে এই গবেষণা করা হয়।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সাঁওতালদের ভাষার উদ্ভব আলোচনা, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় ও বিশ্লেষণ। এর ফলে সাঁওতালি ভাষা বিষয়ে স্বচ্ছ এবং যথার্থ ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। এ কারণে উল্লেখিত বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ রচনার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আদিবাসীদের উন্নয়নে ও তাদের শিক্ষা গ্রহণে মাতৃভাষার যে গুরুত্ব রয়েছে-সে দিক থেকে সাঁওতালি ভাষা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

গবেষণা পদ্ধতি

ভাষা ব্যবহার করে মানুষ। সমাজ মানুষের এই ভাষার ওপর নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করে । তাই মানববিদ্যা এবং সমাজবিদ্যা উভয় শাখাতে আলোচিত এবং বিশ্লেষিত হয় ভাষা । এ গবেষণার মূল বিষয় যেহেতু *সাঁওতালি ভাষা: উৎস ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, এই কারণে গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে যেমন ভাষার (জাতিরও) উৎস সন্ধান করতে ঐতিহাসিক, সমাজ-নৃবিজ্ঞানীদের লেখা পাঠ ও পর্যালোচনা করতে হয়েছে, তেমনি ভাষাসমূহের ধ্বনি, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজনে–সংশ্লিষ্ঠ ভাষিক-উপাত্ত সংগ্রহ করে তার রূপ-ধ্বনিতাত্ত্বিক (Morphophonemic) এবং রূপবাক্যতাত্ত্বিক (Morpho-syntax) বিশ্লেষণ করতে হয়েছে । এ প্রবন্ধের গবেষণা পদ্ধতি মূলত তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে।

ক) লিটারেচার রিভিউ।

খ) ভাষা-উপাত্ত সংগ্রহ।

গ) উপাত্ত বিশ্লেষণ।

উল্লেখ্য যে, উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে দু-ভাবে এবং দুটি উৎস থেকে।

ক) প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ।

খ) সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে।

উপাত্ত সংগ্রহের দুটি উৎস হচেছ-

ক) প্রাথমিক উৎস (Primary Sources).

খ) দ্বৈতয়িক উৎস (Secondary sources)

প্রাথমিক উৎস

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে (North Bengal) বসবাসরত সাঁওতাল আদিবাসীদের কাছ থেকে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত ভাষা-উপাত্তই এ গবেষণার প্রাথমিক উৎস।

দ্বৈতয়িক উৎস

দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হবে বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা-বিষয়ক প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, গ্রন্থ, ভ্রমণকাহিনী, গেজেটিয়ার, রিপোর্ট, সেমিনারপত্র, সুপারিশপত্র, সংকলন, জরিপ প্রতিবেদন, জনগণনা (Population Census) রিপোর্ট, অভিসন্দর্ভ, ওয়েব সাইট প্রভৃতি।

গবেষণা প্রক্রিয়া

প্রথমে আদিবাসী ভাষার রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং কিছু নির্ধারিত শব্দ (আত্মীয়বাচক, প্রকৃতি, পশু-পাখি ইত্যাদি বিষয়ক ৭৫০টি শব্দ) তালিকা সংবলিত প্রশ্নপত্র তৈরি করি । অত:পর এ প্রশ্নপত্র কখনো আদিবাসী এলাকায় নিজে গিয়ে, কখনো পাঠিয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করি। উপাত্তের মান যাচাই করার প্রয়োজনে এমন কী সাঁওতালি ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য (Dialect) অনুসন্ধান করতে অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক প্রশ্নপত্র দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় উপাত্ত সংগ্রহ করে তুলনামূলক পর্যালোচনা (Comparative Study) করা হয়েছে। অন্যদিকে সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে একজন আধিবাসী ভাষার তথ্যপ্রদানকারীকে (Informant) নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে (কখনো দু-তিন দিন) সংশ্লিষ্ট ভাষার ধ্বনিসমূহ চিহ্নিত করতে চেষ্টা করি। সাক্ষাৎকারে ধ্বনি, স্বরের বৈচিত্র্য ছাড়াও বাক্যের গঠন ও বৈচিত্র্য সন্ধান করা হয়েছে। এমন কি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত যে সব তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিয়েছে সেগুলিও এখানে যাচাই-বাছাই করেছি। কখনো বা লিটারেচার রিভুয়ের দ্বারা পূর্ববর্তী গবেষকদের (যেমন- গ্রিয়ারসন, বিশ্বনাথ মুর্মু প্রমুখ) সংগ্রহীত উপাত্ত পর্যালেচনা করেছি এবং সহায়তা নিয়েছি। আদিবাসী ভাষার উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেমন স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনি চিহ্নিত করে তা উচ্চারণ স্থান ও রীতিতে উপস্থাপন করেছি, তেমনি রূপতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ যেমন কারক-বিভক্তি, সর্বনাম, বহুবচন, লিঙ্গ ইত্যাদি উদাহরণসহ আলোচনা করেছি। তবে গবেষণার আয়তন সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ রেখে অর্থতাত্ত্বিক (Semantics) আলোচনা করা হয়নি।

সাঁওতালি ভাষা: উৎস প্রসঙ্গে

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশে সাঁওতালদের মোট সংখ্যা ২০২৭৪৪। প্রকৃত পক্ষে এই সংখ্যা তিন লক্ষাধিক। অন্যদিকে ১৯৪১ সালের ভারতবর্ষের আদমশুমারির রিপোর্টে দেখা যায় সমগ্র বাংলা অঞ্চলে সাঁওতালদের সংখ্যা ৮২৯০২৫ এবং বাংলাদেশ তথা পূর্ববঙ্গে ২৮২৬৪২ জন। যদিও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে ভূমি থেকে উচ্ছেদ, দারিদ্রতা এবং নানা অত্যাচার, শোষণ-নিপীড়নের কারণে সাঁওতালদের অনেকেই এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

বাংলাদেশে সাঁওতালদের আবাস প্রধানত রাজশাহী বিভাগ। এছাড়াও সিলেটের চা বাগানে কিছু সংখ্যক সাঁওতালেলা কর্মসূত্রে বসবাস করে আসছেন দীর্ঘদিন থেকে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সাঁওতালই দ্বিভাষিক (Bilingual)। তবে কোনো কোনো অঞ্চলে এরা বহুভাষিক (Multilingual) অর্থাৎ তাদের নিজেদের ভাষা সাঁওতালি, বাংলা এবং সাদরি ভাষা জানে। যেমন চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার হাটরাজবাড়ি এলাকার অধিকাংশ সাঁওতালই ঘরে সাঁওতালি বাইরে বাংলা অথবা সাদরি ভাষা ব্যবহার করে।

গবেষক অতুল সুর তার বাঙ্গালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় (১৯৭৯) গ্রন্থে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষের যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন- খর্বাকৃতি, মাথারখুলি লম্বা থেকে মাঝারি, নাক চওড়া ও চ্যাপটা, গায়ের রঙ কালো এবং ঢেউ খেলানো এর সঙ্গে সাঁওতালদের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় । আর সম্ভবত এজন্যই এদেরকে অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া ভাষাগত পরিচয়েও এরা অস্ট্রো-এশিয়াটিক। নৃতত্ত্ববিদদের ধারণা এরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম। এক সময় এরা বাস করতো উত্তর ভারত থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত। ভারত থেকে এরা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে

গিয়েছিল আনুমানিক ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্বে (অতুল সুর, ১৯৭৬, ২৩)। এদের সাঁওতাল নামকরণ নিয়ে নানা মতবাদ ও বিতর্ক রয়েছে। তবে সাঁওতলরা যে আর্যদের আগমনের পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলে বসবাস করতো এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এরা মূলত হাজারিবাগ, মালভূম (চায় চাম্পা) এবং বিহার সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাস করছিল প্রাচীন কাল থেকে। মোঘল আমলে এরা বিতাড়িত হয়ে হাজারিবাগ, মালভূমের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ছেড়ে সাঁওতাল পরগনা ও নিকটস্থ জঙ্গলে আবাস গড়ে তোলে। সাঁওতালরা আজো 'হোড়/হড়' বা মানুষ মনে করে নিজেদেরকে। অন্যদিকে এই অশিক্ষিত আদিবাসীদের সরলতার সুযোগ নিয়ে জমিদার, মহাজন, প্রশাসক, স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুরা এদেরকে শোষণ করে, সেই সঙ্গে রয়েছে ইংরেজদের অত্যাচার। আর এ কারণেই অন্যদেরকে এরা বলে 'দিকু' (এর অর্থ পুরোপুরি মানুষ নয়) অর্থাৎ ডাকাত, বিদেশী বা যারা ক্ষতি করতে এসেছে (ধনপতি বাগ ; ১৯৮৩;৭)।

সাঁওতালি ভাষা মূলত মুন্ডা ভাষা হলেও এদের ভাষার সাঁওতালি নামকরণ বিদেশী বিশেষ করে মিশনারিদের দ্বারা ঘটেছে (রফিকুল ইসলাম; ১৯৯৮; ১০৩)। জর্জ গ্রিয়ারসন ও ম্যাকসমুলার উভয়ই মুণ্ডা শব্দ প্রয়োগ করেছেন। সাঁওতালেরা নিজেদেরেকে বলে "হোড়" যার অর্থ মানুষ। আর তাদের ভাষা হচ্ছে "হোড় রোড়" অর্থাৎ মানব ভাষা। সাঁওতাল শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও এঁদের মতে প্রকৃত উচ্চারণ হবে 'সাঁন্তাল'। চারুলাল মুখাজ্জি (The Santals; 1962) জানাচ্ছেন Skrefsrud এর মতে- 'সাঁওতাল' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে সুতার (Soontar) থেকে। 'কেউ কেউ আবার বলেছেন, তারা সুদীর্ঘ দিন সাঁওত বা সামন্ত-ভূমিতে বাস করার ফলে তাদের প্রচলিত নাম হয়ে পড়ে সাঁওতাল। অনেকে আবার সাঁওতালিদের পূর্ব জাতিগত পরিচয় 'খেরওয়াড়' বলেও অভিহিত করে থাকেন (মুহম্মদ আবদুল জলিল; ১৯৯১; ১)। আমাদের এ অঞ্চলের প্রাচীনতম ভাষা হচ্ছে কোল (মুণ্ডা) বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক খেরোয়াল ভাষা। এদের মধ্যে সাঁওতালরাই হচ্ছে প্রধান। 'মুন্ডা, হো, খেড়িয়া, জুয়াং অসুর, ভুমিজ, মাহালি, সরভ, কোড়া, করকু, তুর প্রভৃতি প্রায় ছোট বড় ১৮টি জাতি বা দলের মানুষ রয়েছে এই ভাষা বংশের। সুবোধ ঘোষ ভারতের আদিবাসী গ্রন্থে (২০০০; ৯৯) মূল অষ্টিক ভাষার দুটি শাখা (ভারতে) দেখিয়েছেন। একটি আসামের "খাসি" অন্যটি মুণ্ডারি। এই মুণ্ডারি শাখার খেরোয়ারি ভাষাসমূহের প্রধান হচ্ছে সাঁওতালি (মুণ্ডারি,পূর্বী)।

'মুণ্ডারি শ্রেণীর ভাষা অর্থে খেড়িয়া হো সাঁওতাল গোষ্ঠীর ভাষা বুঝায়। কেউ কেউ একে কোল বর্গের ভাষা বলেন। মুণ্ডারি ভাষার সঙ্গে ফিনো-উগ্রিয়ান ভাষার অদ্ভত সাদৃশ্য রয়েছে। মুণ্ডাদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে তারা পশ্চিম থেকে পূর্ব দেশে এসেছেন। মুণ্ডা সাঁওতালদের সঙ্গে ফিনো-উগ্রিয় জাতিদের সাংস্কৃতিকগত আচার অনুষ্ঠানেরও সাদৃশ্য আছে (De Hevesy, পূর্বোক্ত; ২০)। সাঁওতাল জাতির উদ্ভব বিষয়ে সাঁওতালি গবেষক বিশ্বনাথ মুর্মূ (১৯৯৫; ১০৬) লিখেছেন- জাতি হিসেবে সাঁওতাল নাম প্রচলনের পূর্বে খেরওয়াল নামটাই প্রচলিত ছিল। সাঁওতালদের গানে ও গল্পে নিজেদের খেরোয়াল হিসেবে পরিচয় প্রদানের অথবা উল্লেখের প্রাধান্যই এ কথা প্রমাণ করে। কালক্রমে কেমন করে খেরওয়াল বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একটা শাখা সাঁওতাল জাতি নামে সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করে। সুনীতিকুমার তাঁর গ্রন্থে (১৯৯২; ৯) লিখেছেন- 'ভারতীয় দক্ষিণভাষাগুলি তিনটি শ্রেণীতে পড়ে (১) কোল বা মুণ্ডা শ্রেণী। ইহাতে আসে, সাঁওতালি । ... ভারতের আদিম ভাষাগুলির মধ্যে সাঁওতালি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের ভাষা। বিহার

প্রদেশে-বিশেষ করিয়া সাঁওতাল পরগণা, উড়িষ্যা, বাংলাদেশ বিশেষ করিয়া পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং আসাম এই সমস্ত স্থানে সাঁওতালদের বাস। ইহাদের আদি ভূমি হইতেছে বিহারে; উত্তরবঙ্গ ও আসামে মজুরিগিরি করিবার জন্য দলে দলে গিয়া ইহারা বাস করিতেছে'।

বাংলাদেশে সাঁওতালদের আগমন ঘটেছে নানা কারণে। এর মধ্যে জমিদার মহাজনরা যেমন তাদের কাজের প্রয়োজনে সাঁওতালদেরকে উত্তরবঙ্গে এনেছেন। এ ছাড়া এরা নিজেরাই জীবিকার সন্ধানে খাদ্য ও আবাসস্থান সংকটে এমন-কী ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণে ইংরেজকর্তৃক পরাজিত-বিতাড়িত হয়েও অনেক সাঁওতাল এ অঞ্চলে চলে এসেছে।

> Santals came originally to clear land, build rail roads and do other labor, and many of them work today as landless, laboures, but some have assets... They generally speak their language, but the men also speak Bengali; Santals is writen in the Devavagari Script (in India) or in romans script (Qurashi, co; 1984;18).

অস্ট্রিক পরিবারের মুণ্ডা গোষ্ঠীর সমৃদ্ধ ও জীবন্ত ভাষা হলেও সাঁওতালি ভাষার কোন নিজস্ব লিপি নেই। উনিশ শতকের দিকে প্রধানত মিশনারিদের উদ্যোগে সাঁওতালি ভাষা চর্চা শুরু হয়। এরা মূলত রোমান লিপি ব্যবহার করে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যকে রূপদান করেন। সাঁওতালি লিপির বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Peter S. Tudu লিখেছেন (আড়াঙ; ২০০৫; ২০) 'The West Bengal Santal have the Bengali script Santali, Orissa have the oriya script, Santali, Bihar and Jharkhand, Devnagri script Santali. All these scripts are state sponsored scripts, except in West Bengal there the gernment has been patronizing Bengali script Santali at the same time it has published a roman script Text book for the higher secondary education'. এদের মধ্যে বোর্ডিং (Bodding Rev. P.O. 1929 - 1936) রচিত A Santals Dictionary in 5 volumes (aslo) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাঁচ খণ্ডের বিশাল আয়তন এই গ্রন্থ এযাবত কালের মধ্যে সাঁওতালি ভাষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়াও এন্ড্রু ক্যাম্পবেলস এর Santal English Dictionari- (1953) অন্যতম গ্রন্থ। অন্যদিকে বিশ শতকের তিন চার দশকে শিক্ষিত সাঁওতাল সম্প্রদায় নিজের মাতৃভাষা চর্চা বিশেষ করে পঠন-পাঠন ও লেখালেখি শুরু করেন এবং বাংলা ও নাগরি লিপিতে সাঁওতালি সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। তবে একথা ঠিক বাংলাদেশে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা ব্যাপক অর্থে হয়নি এখনো পর্যন্ত। ভারতে 'সাঁওতাল সমাজের একাংশের প্রচেষ্টায় অলচিকি লিপিতে সাঁওতালি সাহিত্য চর্চা শুরু করা হয় - যার স্রষ্ঠা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু। সমগ্র ভারতে বসবাসকারী সাঁওতালদের মধ্যে প্রায় পঞ্চশ লক্ষ সাঁওতাল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বসবাস করে। যার ফলে ওরা একই সাথে দুটি বা তিনটি ভাষায় কথা বলেন। ১৯৭৯ সালে পুরুলিয়া জেলার হুড়া থানার কেঁদবোনা মাঠে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাঁওতালি ভাষার জন্য অলচিকি লিপিকে স্বীকৃতি দেন। যাঁরা এতদিন রোমান ও বাংলা হরফে সাঁওতালি ভাষার চর্চা করছিলেন তারা প্রতিবাদ জানান (অনিমেষ কান্তিপাল; ২০০৩; ৪)। এখনো পর্যন্ত ভারতে সাঁওতালদের লিপি সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রদেশ ও অঞ্চল ভেদে তারা ভিন্ন ভিন্ন লিপি ব্যবহার করে। অন্যদিকে বাংলাদেশে সাঁওতালরা মিশনারিদের উদ্যোগে রোমান হরফে ব্যবহার করে আসছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এটি খুব সীমিত পর্যায়ে এবং তা শুধুমাত্র খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী সাঁওতালদের

মধ্যে সীমাবদ্ধ (BRAC Study ৩, ২০০৪)। তবে একুশ শতকের শুরুতেই রাজশাহী জেলার গোদাগাড়িতে কয়েকটি বিদ্যালয়ে বাংলা লিপি ব্যবহার করে সাঁওতালি ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান শুরু হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সাঁওতালরা দ্বিভাষী তো বটেই কখনো কখনো বহুভাষীও (যেমনঃ সাঁওতালি, বাংলা ও সাদরি)। একই সঙ্গে এদের ভাষায়ও আর্থ-সমাজ-সংস্কৃতির কারণে ব্যাপক পরিবতন এসেছে। সুনীতিকুমারের মতে (১৯৯২; ১) 'সুসভ্য প্রতিবেশীদের ব্যবহৃত আর্য ভাষা' প্রথমে বাধ্য হয়ে শিখছে পরে ধীরে ধীরে আর্যকরণ ঘটছে ভাষা জগতের নিজস্ব নিয়মে। এভাবেই এক সময় এ ভাষাগুলো বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

দুই ভিন্ন পরিবার ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সাঁওতালি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠতা বা সম্পর্ক আমাদের অজানা নয়। বিশেষ করে এই সাদৃশ্য মূলত এর শব্দ ভাণ্ডারের পারস্পরিক লেন-দেনের জন্য। তাছাড়া নৃতাত্ত্বিক ভাবে বাঙালি যে সংকর জাতি সেই সংকরের উপাদান হিসেবে সাঁওতালি প্রভাব অস্বাভাবিক নয়। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার যে মাগধি থেকে বাংলার জন্ম তার সঙ্গে 'মাগহী, ভোজপুরি, মৈথিলি, ওড়িয়া ও অসমিয়ার মধ্যে বাংলা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে সাঁওতালি প্রভাবের জন্য, (সুহৃদকুমার; ১৯১১; ৭)। তার সপক্ষে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন এবং উভয় ভাষার কিছু তুলনামূলক চিত্র (শব্দ ভাণ্ডার ছাড়াই) তুলে ধরেছেন। এ ক্ষেত্রে বাংলা দলবৃত্ত (Syllabic metre) বা ছড়ার ছন্দ এসেছে সাঁওতালি থেকে। যেমন -

বাংলা - বৃষ্টি পড়ে/ টাপুর টুপুর/ নদে/ এলো/বান
শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে/তিন কন্যে/দান

সাঁওতালি- কুচিত কুলছি/আখড়া সঙ্গে। কুড়ি জিরা/ ডাঃর..
kucit̪ kulcʰi/ akʰɽa ʃɔŋge . kuɽi ɟira/ dɛr...
(সবু সবু রাস্তার মোড়ে অনেক মেয়ে জমে গিয়েছে)।

ধবনিগত এই সাদৃশ্য ছাড়াও বাক্যগঠন ও ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলা 'তো' ব্যবহৃত হয় কথা বলার বিশেষ ঢঙ বা অনুভূতি প্রকাশ করতে। সাঁওতালি ভাষায়ও 'দ'[d̪] প্রয়োগ হয় একই অর্থে দৃঢ়তা বাচক অব্যয়।

বাংলা - এখন আমি তো যাচ্ছি।

সাঁওতালি - নিত দ-ইঞ চালাক না। [nit̪ d̪ɔ iɲɔ calak na]

বাংলা ভাষায় আমরা টি/টা [ti/ta] নিয়মিত ব্যবহার করি। এই 'নির্দেশক টি-টা [ti/ta] আমার ধারণা বাংলায় এসেছে সাঁওতালি 'টাং [taŋ] বা টানের' [ṭaner] থেকে। মিৎটাং দারে তাহেকানা - [mit̪taŋ d̪are t̪ahekana]একটা গাছ ছিল। আমার মনে হয় কোল ভাষা গোষ্ঠীর এটি একটি বৈশিষ্ট্য' (সুহৃদকুমার; ১৯৯৯; ৭)।

ধ্বনিগত সাদৃশ্য ছাড়া 'অন্যান্য ব্যাকরণিক মিলও আছে। মুণ্ডার মতো সাঁওতালিতেও স্বরবর্ণ আনুনাসিক হতে পারে। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ বোঝাবার জন্য ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়। স্ত্রী প্রত্যয় (ই/ঈ) [i] যোগেও সাঁওতালীতে লিঙ্গান্তর হয়' (আলি নওয়াজ; বাংলা পিড়িয়া খন্ড-২; ১২)। তথ্যটি সঠিক নয়, সাঁওতালি ভাষায় শুধুমাত্র কড়া [kɔɽa] (ভাই), কড়ি [kɔɽi](বোন) এই ক্ষেত্রে 'ঈ'[i] প্রত্যয় যুক্ত হয়। গরু এবং ভেড়া-র বেলায়ও স্ত্রী লিঙ্গে 'ই'[i] প্রত্যয় যুক্ত হয়)। আর অন্য সব স্ত্রী লিঙ্গে সাঁওতালি ভাষায় নিজস্ব প্রত্যয়

যুক্ত হয়। সাঁওতালি ভাষায় সম্বন্ধবাচক শব্দে লিঙ্গান্তরে বৈচিত্র্যময় প্রত্যয় (Suffix) এর প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন; হপনবা [hɔpnɔba](চাচা), হপন [hɔpɔn] (চাচী), গড়মহাড়াম [gɔɽɔmhaɽam] (দাদা), গড়ম বুঢ়ি [gɔ̆ɔmbŭʰi] (দাদী), হঞহারমা [hɔharma](তোমার শ্বশুর), হানহারম্যা [hanɔharmæ] (তোমার শ্বাশুড়ি) শেষোক্ত উদাহরণে লক্ষ করবো প্রত্যয়ের পরিবর্তন ঘটে উপসর্গের ভিন্নতায় লিঙ্গান্তর ঘটেছে। সাঁওতালি ভাষায় সম্বন্ধ বা আত্মীয়বাচক শব্দের ক্ষেত্রে এক স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যা বাংলা বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীতে অনুপস্থিত। যেমন পুরুষ ভেদে সম্বন্ধ পদের রূপের পরিবর্তন ঘটে। আমার ভাই (বকঞ) [bɔkɔiɔ̃], তোমার ভাই (বকম)̃ [bɔkɔmɔ] তার ভাই (বকৎ)[bɔkɔt̪] এ
ক্ষেত্রে সম্বন্ধ বা আত্মীয়বাচক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হচেছ।

ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ধ্বনিতত্ত্ব

সাঁওতালি ভাষার স্বরধ্বনি ৭ টি। বাংলা অ্যা (æ) ধ্বনি নেই কিন্তু অ (ɔ) এবং ও (o) ধ্বনির মধ্যবর্তী একটি না-প্রসৃত না-গোলাকার ধ্বনি (ɛ) পাওয়া যায় যা অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চারিত হয়। শব্দের শেষে নাসিক্য উচ্চারণ প্রবণতা সাঁওতালি ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানে সাঁওতালি স্বরধ্বনিসমূহ দেখানো হল –

i, e,ɛ, a, ɔ, o, u

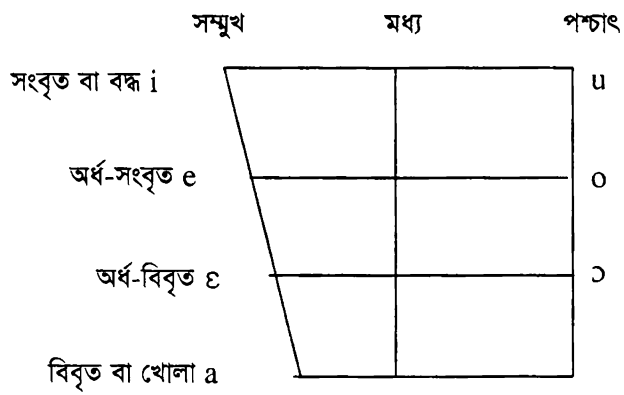

সাঁওতালি ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি পাওয়া যায়: y w.

সাঁওতালি ভাষায় মোট ৩১টি ব্যঞ্জনধ্বনি পাওয়া গেলেও প্রধানত ২৮টি ব্যবহৃত হয়। কয়েকটি ধ্বনি অনুচ্চারিত বা খুব ক্ষীণ ভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন: p, k, t (আপ্ /ap/ = পাখির বাসা, এখানে প (p) ধ্বনি উচ্চারণ খুবই ক্ষীণ)।

ব্যাঞ্জনধ্বনি

	Bilabial দ্বিওষ্ঠ		Labeodental দন্তৌষ্ঠ	Dental দন্ত		Alveolar দন্তমূলীয়	Retroflex প্রতিবেষ্টিত		Post-alveolar পশ্চাত দন্তমূলীয়		Palatal তালব্য		Velar জীহ্বামূলীয়		Glottal কণ্ঠনালীয়
স্পৃষ্ট	p	b		t̪	d̪		ʈ	ɖ			c	ɟ	k	g	
	pʰ	bʰ		t̪ʰ	d̪ʰ		ʈʰ	ɖʰ			cʰ	ɟʰ	kʰ	gʰ	
নাসিক্য	m						n						ŋ		
কম্পনজাত						s					ʃ				ɦ
তাড়নজাত				ɾ			ɽ								
							ɽʰ								
উষ্ম/ fricative	ʋ												w		
পার্শ্বিক উষ্ম				l							y				

রূপতত্ত্ব

ক। অব্যয়

বাংলা কে [ke], ই [i] (কি) অর্থে সাঁওতালিতে 'ক'[k] , গংয়া [gɔya], দো [d̪o] অব্যয়, বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের শেষে যুক্ত হয়। এটি মূলত নির্দেশক অব্যয়। যেমন: ও-ই বড় = উনিগ্যা মারাং আয়[uniggya maraŋ ay] । সাঁওতালিতে am (আম) = তুমি, amd̪o= তুমিকি।

বাংলা তে/তে ই [t̪e/t̪ei] অর্থে 'থ'[t̪ʰ] ব্যবহৃত হয় বতমান ও ভবিষ্যতকালে। যেমন: চলত বাজারে যাই= দেলা থ বাজার তে গে [d̪ela t̪ʰɔ bajar t̪e ge]

দ-মূলত বস্তবাচক বিশেষ্য, সর্বনাম এমনকী ক্রিয়াপদের পরে ব্যবহৃত হয়। দৃঢ়তাবাচক অব্যয় এটি। সে/শে [se/ʃe] অব্যয়টি যে শব্দের শেষে বসে তার সঙ্গে এবং বাক্যের অর্থ সঙ্গতিতে সাহায্য করে।

সাঁওতালি ভাষায় একই বাক্যে দু-তিনটি অব্যয়ও ব্যবহার হতে পারে।

খ। ইক' [ik]প্রত্যয়

প্রাণীবাচক বিশেষ্য বা ব্যক্তিবাচক সর্বনামের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন: আদাই+ইক [ad̪ai̯ ik] আদাইক্[ad̪aik] (আদায়কৃত), গিড়ি+ইক [giri +ik] = গিড়িক্ [girik] (পতিত) এ ছাড়াও---অক্[ɔk],আক [ak],উক, [uk]-এক্[ek],ওক [ok] প্রভৃতি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য তৈরি হয় (যেমন: গের+অক [ger̯ ɔk]=গেরক [gerɔk=কামড়ানো)। সাঁওতালি ভাষার গবেষক পরিমলচন্দ্র মিত্র এই ভাষায় ছয় প্রকার প্রত্যয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচেছ-- বিভক্তি, কৃৎ, সমাপিকা চিহ্ন প্রত্যয়, তদ্ধিত, স্ত্রী প্রত্যয় ও ধাত্বাবয়ব (১৯৮৫; ৪০)। অভ্যন্তর (Infix) প্রত্যয় সাঁওতালি ভাষার অন্যতম নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

১। 'প' [pɔ] অভ্যন্তর প্রত্যয় পরস্পরকে বোঝাতে ধাতুর প্রথম বর্ণের পর যুক্ত হয়। যেমন: লাই [lai] =বলা কিন্তু লা+প+আই [la̯+ pɔ̯+ ai] লাপাই [lapai] অর্থাৎ পরস্পর কথা বলা।

২। তদ্ধিত প্রত্যয়। সাঁওতালিতে শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে প্রচুর নতুন শব্দ গঠন করে। তদ্ধিতান্ত শব্দ বিশেষ্য এবং বিশেষণ উভয় হতে পারে। যেমন:

- নির্দিষ্ট অর্থে - এ [e] , নে [ne],এয়া [ea] , টা [ta], টেঙ [teŋ] ইত্যাদি। পোন+এ [pon +e] = পোনে [pone] চারি), পে+এয়া [po +ea]= পেয়া [pea] (তিনটি) মিৎ+টেং [mit̪ +teŋ] মিৎটেং[mit̪ten]= একটি।
- -ইয়া [ea]প্রত্যয় তৎ সম্পর্কীয়, তৎ সদৃশ ইত্যাদি। যেমন: আধার+ইয়া [ad̪ʰar+ ia] আধারিয়া [ad̪ʰaria] (অল্প) বারোমাস +ইয়া [baromaʃ + ia] = বারোমাসিয়া [baromaʃia] (বারমাসই)।
- নামের সঙ্গে -আই [ai]আ [a], -অন [ɔn] যুক্ত হয়ে বিশেষ্যকে বিশেষণে রূপান্তর করে (যেমন: বাংলা ভাষায় মোঘল+আই [mogʰol +ai] = (মোঘলাই) [mogʰlai] যেমন: বুধ+আই [bud̪ʰ+ ai]=বুধাই[bud̪ʰai], গুরু+আই [guru + ai]= গুরাই[gurai]

গ) সন্ধি

সাঁওতালি ভাষায়ও নিজস্ব নিয়মে দুটি শব্দের মিলন বা সন্ধি হয়ে থাকে। সাঁওতালিতে কয়েকটি সন্ধি-সূত্র নিম্নরূপ–

১। অকার কিংবা আকারের পর আকার থাকলে উভয় মিলে আকার হয় এবং আকার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন- মেন+আ [men+ai] =মেনা[mena](বলা), কিরিঞ+আ [kiriɔ̯̃ a] =কিরিঞা [kiriẵ] (কেনা)।

২। পূর্ব পদের শেষে 'ৎ' [t̪] থাকলে এবং উত্তর পদের পর্বে আ[a] ,ই[i],এ [e] ইত্যাদি স্বরবর্ণ থাকলে 'ৎ' এর মূলে 'দ' [d̪ɔ] হয় এবং উত্তর পদের স্বরবর্ণানুসাওে -দা [d̪a], -দি [d̪i] ,-দে [d̪e] প্রভৃতি হয়। যেমন: মেনকেৎ+আ [menket̪ a] = মেনকেদা [menked̪a] (বলেছিল)।

৩। পূর্ব পদের শেষে 'চ'[c] থাকলে এবং উত্তর পদের শুরুতে আ [a], এ [e] ইত্যাদি স্বরবর্ণ থাকলে উভয় মিলে চ [c] এর স্থানে 'জ'[j] হয়। যেমন: হিরিচ+এনা [hiric+ ena] = হিরিজেনা [hirijena] (অচেতন বস্তুর পতন/পড়েছে অর্থে)।

ঘ) পুরুষ ও বচন

সাঁওতালি ভাষায় পুরুষ এবং বচনের ক্ষেত্রে কিছু স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। পুরুষ ভেদে যেমন বচন ভেদ রয়েছে। তেমনি জড় ও জীব ভেদেও বচনের রূপ ভিন্ন। তাছাড়া বাংলা ভাষার মতো সাঁওতালিতে ২টি বচন (এক বচন ও বহুবচন) নেই। এখানে তিনটি বচন ব্যবহৃত হয় (সংস্কৃত ভাষার মতো)। যেমন-

ক। এক বচন- মিৎহড় [mit̪hɔ̆ɽ] (একটি মানুষ)

খ। দ্বিবচন - বার হড় [barohɔ̆ɽ] (দুজন মানুষ)

গ। বহুবচন- যত হড় [jɔt̪ohɔ̆ɽ]বা আডি হড় [adihɔ̆ɽ] (অনেক মানুষ)

এখানে সংখ্যাবাচক শব্দ প্রয়োগ না করেও বচন নির্দেশ করা যায়। যেমন- ধিরিকিন্ [d̪ʰirikin](দুটি পাথর), ধিরিকো [d̪ʰiriko] (পাথরগুলি)। 'বাক্যের কর্তা চেতন পদার্থ হইলে, ক্রিয়ার সহিত কর্তার সর্ব্বনাত্মক সংক্ষিপ্ত রূপ বচন ভেদে পরিবর্তিত হইয়া সন্ধিযুক্ত হইতে পারে। ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয় না (পারিমলচন্দ্র মিত্র; ১৯৮৫; ৮০) যেমন- চালাঃকানাঞ [calakanaiɔ̆](আমি যাচ্ছি) কিন্তু চালাঃ কানাল্যা [calakanalla] (আমরা যাচ্ছি)। এখানে বিভিন্ন পুরুষে বচনভেদ দেয়া হল:

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন (দুজন/দুই অর্থে)	বহুবচন
উত্তম	ইঞ [iɔ̆]আমি)	আলিঞ [aliɔ̆](আমরা)	আল্যা [allaʃ (আমরা)
উত্তম	ইঞ[iɔ̆](আমার, জড়)	আলিঞঃ [aliɔ̆c] (আমাদের, জড়)	আল্যায়া [αllαψα] (আমাদের, জড়)
উত্তম	ইঞিচ [iˇicɔ] (আমার, জীব)	আলিঞিচ [aliɔc] (আমরা দুজন, জীব)	অ্যাল্যায়িচ [alaiɔc] (আমাদের, জীব)
মধ্যম	আম[am] (তুমি)	আবিন [abin] (তোমরা দুজন)	আপ্যা[appa] (তোমরা)
মধ্যম	আমাঃ [ama] (তোমার,জড়)	আবিনাঃ [abina] (জড়) তোমাদের	আপ্যায়াঃ [appaya] (জড়)
মধ্যম	আমিচ্ [amic] (তোমার জীব)	আবিনির্চ [abinic] (জীব)	আপ্যায়িচ্ [appaic] (জীব)
প্রথম	উনি [uni] (সে)	উনকিন [unkin] (ওরা দুজন)	উনকু [unku](ওয়া)
প্রথম	উনিয়াঃ [uniya] (ওর, জড়)	উনকিনাঃ [unkina] (জড়)	উনকুওয়া [unkuoa] (জড়)
প্রথম	উনিয়িচ্ (ওর, [unic] (জীব)	উনকিনিচ্ [unkinic] (জীব)	উনকুয়িচ্ [unkuic] (জীব)

এছাড়াও সাঁওতালিতে ওই, যে, সে, একবচন দ্বিবচন এবং বহুবচন বোঝাতে যথাক্রমে হানি [hani], হানকিন [hankin]এবং হানকু [hanku] ব্যবহার হয়। সাঁওতালি ভাষায় উত্তম পুরুষে একবচনে বর্তমান কালে- কানা [kana], কানাঞ [kanaiɔ], এ্যাদা [eda], এ্যাদাঞ [eḍaiɔ], দ্বিবচনে- কানা [kana], কানালিঞ [kanaliɔ], এ্যাদা [eḍa] এ্যাদালিঞ [eḍaliɔ], বহুবচনে- কানা [kana], কানাল্যা [kanalla], এ্যাদা [eḍa], এ্যাদালা [eḍala], মধাম পুরুষের একবচনে- কানা[kana], কানাম[kanam], এ্যাদা [eḍa], এ্যাদাম [eḍam], দ্বিবচনে- কানা [kana], কানাবিন [kanabin], এ্যাদা [eḍa], এ্যাদাবিন [eḍabin],বহুবচনে কানা [kana]- কানাপ্যা [kanappa], এ্যাদা [eḍa], এ্যাদাপ্যা [eḍappa]ও প্রথম পুরুষ একবচনে- কানা[kana], কানায় [kanay], এ্যাদা [eḍa], এ্যাদায় [eḍay], দ্বিবচনে- কানা [kana], কানাকিন [kanakin], এ্যাদা [eḍa], এ্যাদাকিন [eḍakin], এবং বহুবচনে- কানা [kana], কানাক [kanak], এ্যাদা [eḍa], এ্যাদাক [eḍak] বিভক্তিসমুহ প্রয়োগ হয়।

অতীতকাল উত্তম পুরুষ একবচনে-ল্যানা [lena], ল্যানাঞ [lenaiɔ], ল্যাদা [leḍa], ল্যাদাঞ [leḍaiɔ], দ্বিবচনে-ল্যানা [lena], ল্যানালিঞ [lenaliɔ], ল্যাদা [leḍa], ল্যাদালিঞ [leḍaliɔ], বহুবচনে ল্যানা [lena], ল্যানাল্যা [lenalla], ল্যাদা [leḍa], ল্যাদাল্যা [leḍalla], মধ্যম পুরুষ একবচনে- ল্যানা [lena], ল্যানাম [lena], ল্যাদা [leḍa], ল্যাদাম [leḍam], দ্বিবচনে- ল্যানা [lena], ল্যানাবিন [lenabin], ল্যাদা [leḍa], ল্যাদাবিন [leḍabin], বহুবচনে- ল্যানা [lena], ল্যানাপ্যা [lenappa], ল্যাদা [leḍa],ল্যাদাপ্যা [leḍappa] এবং প্রথম পুরুষ একবচনে ল্যানা [lena], ল্যানায় [lenay], ল্যাদা [leḍa], ল্যাদায় [leḍay] দ্বিবচনে-ল্যানা [lena], ল্যানাকিন [lenakin], ল্যাদা [leḍa], ল্যাদাকিন [leḍakin] ও বহুবচনে- ল্যানা [lena], ল্যানাক [lenak], ল্যাদা [leḍa], ল্যাদাক [leḍak] বিভক্তিসমুহ ব্যবহার হয়।

ভবিষ্যত কালে উত্তম পুরুষ একবচনে প্রয়োগ হয় আ /ɑ/, আঞ /aiɔ̃/, দ্বিবচনে- আ /a/, আলিঞ /aliɔ̃/, বহুবচনে- আ / a/,আল্যা /alla/, মধ্যম পুরুষ একবচনে- আ / a/, আম /am/, দ্বিবচনে- আ / a/, আবিন / abin/, বহুবচনে- আ / a/, আপ্যা / appa/, এবং প্রথম পুরুষ একবচনে- আ / a/, আয় /ay/, দ্বিবচনে- আ / a/, আকিন / akin/, ও বহুবচনে- আ / a/, আক' /ak/ বিভক্তিসমুহ। উল্লেখিত বিভক্তি বা প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি যথা, আঞ /aiɔ/, লিঞ /liɔ/, ল্যা /la/, আম /am/, বিন /bin/ প্যা /pa/, আয় /ay/, কিন /kin/, ক / kɔ / ইত্যাদি পুরুষ, কাল ও বচন নির্বিশেষে কর্তৃ বা কর্মকারকের পরে বসে বা বসতে পারে। (বিশ্বনাথ মুর্মু; ১৯৯৫; ৮০)

ঙ। ক্রিয়া

প্রত্যেক ভাষায়ই ক্রিয়া হচেছ বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদন। ক্রিয়ার মূল হচেছ ধাতু। এই ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার নানারূপ (কালভেদ, পুরুষভেদ, লিঙ্গভেদ) গঠিত হয়, সাঁওতালি ভাষাতেও তাই। সাঁওতালি শব্দ 'চালাক [calak]= যাই ক্রিয়া এখানে 'চাল' [cal]ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আক্ [ak] প্রত্যয় (চাল্+আক্ [cal+ ak]=চালাক[calak])। আবার চাল্+কান [cal + kan] =চাল্কান্ [calkan] অর্থ চলা বা চলমান, চালাক + তাঁহেকান্ [calak +t̪)ahekan]= চালাক্তাহেকান্ [calakt̪)ahekan] অর্থ চলিয়াছিল। সাঁওতালি ভাষায় এ রূপ বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার কালকে প্রকাশ করে। তবে এগুলোর পৃথক কোন অর্থ নেই। অর্থাৎ রূপমুল হিশেবে বদ্ধ রূপমূল। কখনো কখনো ক্রিয়া উহ্য থেকেও সাঁওতালি ভাষার বাক্য গঠিত হয়। যেমন: উনি বয়হাতিঞ [uni bɔe̯hat̪iɔ̃)]= সে আমার ভাই (হয়)। এই বাক্যে কোন ক্রিয়াপদ নেই।

চ) সর্বনাম

একবচন ও বহুবচন

আমি=ইঞ [iɔ̃]	আমরা = ইঞাঃ [iã) ɘ]
তুমি=আম [am]	তোমার=আমাঃ [amaɘ]
সে (পুং)=উনি/তানি [uni / t̪ani]	তার (পুং)=উনিআঃ [uniaɘ]

সে (স্ত্রী)=উনি/তানিগি/উনি আইহড় [uni/ t̪anigi / uni aihɔɽ}]

তার (স্ত্রী)= উনি আৎগি/উনিআঃ [uni at̪gi / uni uniaɘ]

আমরা= আবু/আলে [abu / ale]	আমাদের= আলেআঃ [aleaɘ]
তোমরা=আপে/আমাৎ [ape / amat5]	তোমাদের=আপেআঃ [apeaɘ]
তারা=ওনকু [ounku]	তাদের=উনকুআঃ [onkuaɘ]
আমাকে=ইঞগি [iɔ̃gi]	এইটা=নোয়াটাঃ [noyataɘ]
তোমাকে=আমগি [amgi]	সেটা=ওনাটা [onata]
তাকে=উনিগি/আনিগি [unigi/ anigi]	ওইটা=হানাটাঃ [hanataɘ]

সর্বনাম ও ক্রিয়ার কাল

আমি খাই= ইঞ জমা [iɔ̃ ɟɔma]	আমরা খাই= আলেলে জমা [alele ɟɔma]
তুমি খাও= আমেম জমমে [amem ɟɔmme]	তোমরা খাও= আপপে জমপে [appe ɟɔmpe]

সে খায়= উনি জমা/আনি জমা [uni ɟɔma/ ani ɟɔma]

তারা খায়= ওনকুকু জমা [onkuku ɟɔma]

আমি খেয়েছি= ইঞজমকেদা [iɔ̃ ɟɔmked̪a]

আমরা খেয়েছি = আলেলে জমকেদা [alele ɟɔmkeda̪]
তুমি খেয়েছ= আমেম জমকেদা [amem ɟɔmkeda̪]
তোমরা খেয়েছ= আপেপে জমকেদা [apepe ɟɔmkeda̪]
তারা খেয়েছে= ওনকুকু জমকেদা [onkuku ɟɔmkeda̪]
আমি খাবো = ইঞ জমা [iɔ ɟɔµa]
আমরা খাবো= আলেলে জমা [alele ɟɔma̪]
তুমি খাবে= আমেম জমা [amem ɟɔma̪]
তোমরা খাবে=আপেপে জমা [apepe ɟɔma̪]
সে খাবে= উনিয় জমা [uniyo ɟɔma̪]
তারা খাবে=ওনকুকু জমা [onkuku ɟɔma̪]

গতকাল= হলা [hɔla]
আগামীকাল= গাপা [gapa]
এবং= আর [ar]
কি= চেৎ [cet̪]
আজ=তিহিঞ [t̪ihi iɔ]
যদি=মেনখান/তাহালে [menkʰan/ t̪ahale]
ইত্যাদি=এমানতেয়াক/আয়মা[emant̪eyak / ayma]

সংখ্যাবাচক শব্দ

এক=মিত্ [mit̪]
দুই=বার [bar]
তিন=পে [pe]
চার=পোন/পুণ[pon/pun]
পাঁচ=মড়ে [mɔɽe]
ছয়=তুরুয় [t̪uruy]
সাত=এয়ায় [eyay]
আট=ইরাঁল [irãl]
নয়=আরেল [arel]
দশ=গেল [gel]
এগারো=গেলমিৎ [gel mit̪]
বারো= গেলবার [gel bar
বিশ=মিদ ইশি/বারগেল [mid̪ iʃi / bar gelo]
খাওয়া=জম [ɟɔm]

ক্রিয়ার রূপ

যাওয়া = চালা [cala]
গিয়েছে=চালাও কানাইঞ [calao kanaiɔ]
যাচ্ছি=চালাকানা [calakana]
যাবে=চালা আইঞ [cala aiɔ]
পাওয়া = ঞাম [iam]
পেয়েছি=ঞামকেদাং [iamked̪aŋ]
পাচ্ছি=ঞামদাইং [iamd̪aiŋ]
পাবো=ঞাম আইঞ [iam aiɔ]
বসা = দুড়ুপ [d̪uɽup]
বসেছি=দুড়ুপনাং [d̪udupnaŋ]
বসছি=দুড়ুপ আইঞ [d̪udup aiɔ̃]
বসবো=দুড়ুপ [d̪udup]

একুশ=মিদ ইশিমিদ/বারগেল মিৎ [miḍ iʃimiḍ / bargel miṭ]

ঘুমানো=জাপিত [ɟapiṭ]

ত্রিশ=পে গেল [pe gel]

পড়া(পড়ে যাওয়া)= ঞুরহা [iurha]

একত্রিশ=পেগেল মিৎ [pegel miṭ]

করা=অংকা/করাও[ɔŋka / kɔrao]

চল্লিশ=বার ইশি/পুনগেল [bar iʃi miṭ /pungel miṭ]

ধরা=সাব [sab]

একচল্লিশ=বারইশি মিৎ/পুন গেল মিৎ [bar iʃi /pungel]

হওয়া=হয়ুআ [hɔyua]

পঞ্চাশ=মোড়েগেল [moɽegel]

একশ=মিৎ সায় [miṭ say]

একহাজার=গেল সায় [gel say]

প্রথম=পাহিল [pahil]

তোলা=আরাকাপ/বাকাব্ [arakap / bakab]

দ্বিতীয়=দোসরা [ḍosra]

শোয়া=গিতিজ [giṭiɟ]

নেয়া=হাতাও [haṭao]

দেয়া=এম [em]

সপ্তাহের সাত দিন ও মাস/কাল

শনি=শনিচার [ʃonicar]

রবি=আঠোয়ার [at^{h}oyar]

সোম=সোমবার [ʃombar]

মঙ্গল=মঙ্গলবার [moŋgolbar]

বুধ=বুধবার [buḍ^{h}bar]

বৃহস্পতি=লক্ষিবার [lokk^{h}ibar]

শুক্র=শুকোলবার [ʃukɔlbar]

গ্রীষ্ম=হয় সিতুং/লল সিতুং [hɔy siṭuŋ / lɔl siṭuŋ]

বর্ষা=বাঁশাঁ [bãʃã]

শরৎ=ভাদর-আশ্বিন [b^{h}aḍar/ aʃin]

হেমন্ত=কাতিক-অঘন [kaṭik / ɔg^{h}ɔn]

শীত=চরয়ার/রাবাংদিন [cɔryar /rabaŋdin]

বসন্ত=বসন্ত মাহা [bɔsɔnto maha]

বাক্যতত্ত্ব

বাংলা ভাষার মতোই সাঁওতালি ভাষার বাক্য গঠন রীতি কর্তা+কর্ম=ক্রিয়া (SOV)। যেমনঃ /iõḍo ḍakaŋ ɟomeḍa/ = (আমি ভাত খাই) = S+O+V

কিন্তু বাংলায় নঞর্থক 'না' বাক্যের শেষে বসলেও (আঞ্চলিক বাংলা কখনো মাঝে বসে) সাঁওতালি ভাষায় ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমনঃ

আমি কিছুই খাব না = ইঞদো চেৎ হো বায়েঁ জোমা /iõd̪o ceț ho baẽ joma/ এখানে baẽ = না, যা ক্রিয়ার পূর্বে বসেছে। তবে বাক্যের গঠনানুসারে কর্তা বা কর্ম অনেক সময় আগে পরে বসে। বাক্যে ব্যবহৃত পরস্পর পদগুলির মধ্যে (মূলত ধ্বনির (ক্ষেত্রে) অনেক সময় উচচারণ জনিত সন্ধি ঘটে। বাক্যের নমুনা-

আপনি কি করেন= আমদো চেতএমচেকায়া? [amd̪o ceț̪emcekaya]

অন্যদিকে প্রশ্নবোধক বাক্যের গঠন হচ্ছে- এইটা কি রঙ? /nowa do ceț raŋ/,

এখানে সাঁওতালি ভাষায় বিভিন্ন প্রকার বাক্যের গঠন বিশ্লেষণ করে দেখানো হল:

আমি ভাত খাই= ইঞদো দাকাঙ জোমেদা /iõd̪o d̪akaŋ ɟomed̪a/

আমি স্কুলে যাই = ইঞদো স্কুলিঞ চালার আ /iõd̪o skulio calar a/

আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাই = ইঞদো দাকা জোমকাতে স্কুলিঙ চালাঃআ /iõd̪o d̪aka ɟomkaț̪e skuliŋ calaha/

আপনি কি করেন ? = আমাদা চেতামে চেকাআ /amad̪a ceț̪ame cekaa/

আমি কিছুই খাব না = ইঞদো চেৎ হো বায়েঁ জোমা /iõd̪o ceț ho baẽ joma/

সোজা হয়ে দাঁড়াও = সজহি তেঃ গুঃ মে / sɔɟohi ț̪eh guh me/

বাসা থেকে রাস্ত দেখা যায় =অড়াঃ খোন হর ঞেল ঞা মোঃ আঃ= /orah k^{h}on hor ẽl moh ah/

সাঁওতালি ভাষায় সরল বাক্য বিশ্লেষণ- আমি ভাত খাই /iõd̪o d̪akaŋ ɟomed̪a/

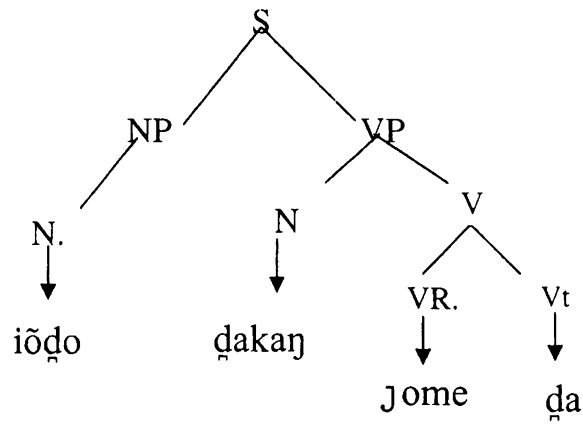

সাঁওতালি জটিল বাক্য বিশ্লেষণ:

আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাই = /iõd̪o d̪aka ɟomkat̪e skuliŋ calaha/

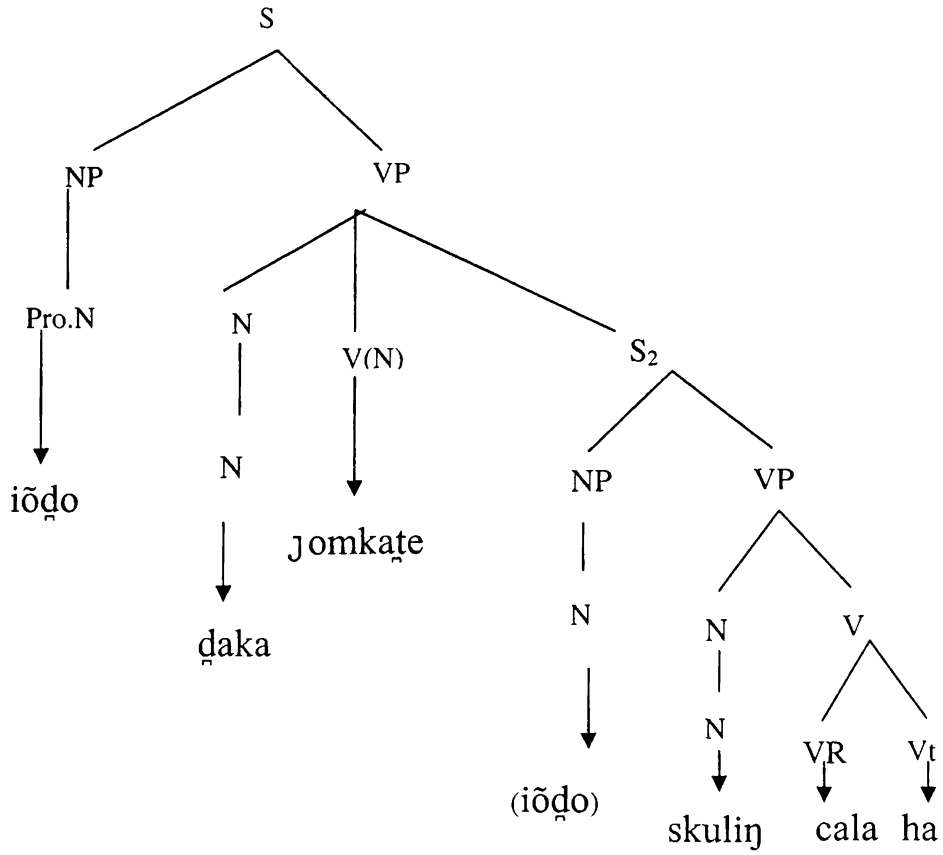

আঞ্চলিক বৈচিত্র্য (Dialect)

সবশেষে বাংলাদেশে সাঁওতালি ভাষার যে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য অর্থাৎ উপভাষাগত (Dialect) পার্থক্য রয়েছে - তা চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে রাজশাহীর নওগাঁ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের সঙ্গে রংপুর-দিনাজপুর-পার্বতীপুরের সাঁওতালদের উপভাষাগত, এমনকী উচচারণের পার্থক্যও আমার মাঠ-গবেষণায় ধরা পড়েছে। উচচারণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হচেছ--রাজশাহী অঞ্চলে যে শব্দে 'উ' /u/ ধ্বনি (উঁচুঁর = ঘূর্ণন, উনি = তিনি) উচচারিত হয়; রংপুর/দিনাজপুরে সে ক্ষেত্রে (আচুর [acur], আনি [ani] 'আ' ধ্বনি উচচারিত হয়। এ ছাড়াও উভয় এলাকায় এমন কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলি শুধুমাত্র স্ব-

স্ব অঞ্চলের সাঁওতালরাই তাদের ভাষায় ব্যবহার করে। যেমন: রাজশাহী অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়- নাইদা [naiḍa] (চাড়ি), পয়রা [pɔyra] (ধ্বানকরা), গাতি [gaṭi] (ছায়া), এ শব্দগুলি রংপুর-দিনাজপুরে ব্যবহৃত হয় যথাক্রমে-চাড়া [caɽa], ডবরু [dobru]ও উমুল [umul]। এখানে কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হল:-

বাংলা	সাঁওতালি (রাজশাহী ও নিকটবর্তী অঞ্চল)	সাঁওতালি (দিনাজপুর, পার্বতীপুর ও নিকটবর্তী অঞ্চল)
চাড়ি	নাইদা [naiḍa]	চাড়া [caɽa]
নিচ জমি	কান্দর[kandɔr]	সোকড়া [sokɽa]
উঁচুজমি	ঢুই [dʰui]	ঢিপি[dʰipi]/কুটকো [kutko]
গরু বেঁধে রাখার খুঁটা	দাড়াক [ḍarEk]	খুন্টো [kʰunto]
ধ্বান করা	পয়রা [pɔyra]	ডবরু [dobru]
কাটা	গেত [geṭ]	জালুম [ɟalum]
ষাঁড়	আদার [aḍar]	আন্ডিয়া ডাংরা [andiya daŋra]
ছায়া	গাতি [gaṭi]	উমুল [umul]
কাস্তে	হাসুয়া [hasua]	দাতরম [ḍaṭrɔm]

গ্রন্থপঞ্জি

অতুল সুর; ১৯৮৮, ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়। সাহিত্যলোক, কলিকাতা

অনিমেষকান্তি পাল (সম্পাদিত) তৃতীয় সহস্রাব্দ; সোসাইটি অবদা থার্ড মিলিনিয়াম; কলকাতা; অষ্টম সংখ্যা; এপ্রিল; ২০০৩।

আব্দুস সাত্তার; ১৯৬৬ ,অরণ্য জনপদে: নসাস (৩য় সং, ২০০০), ঢাকা ।

ক্ষুদিরাম দাস; ১৯৯৮, সাঁওতালি-বাংলা সমশব্দ অভিধান; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি; কলকাতা ।

ধনপতি বাগ; ১৯৮৩, সাঁওতাল সমাজ সমীক্ষা; সমতট প্রকাশনী; কলকাতা ।

ধীরেন্দ্রেনাথ বাস্কে; ১৯৯৬, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস; পার্ল পাবলিশার্স; কলকাতা।

পরিমলচন্দ্র দাশ; ১৯৯৫, সাঁওতালি ভাষা: ভিত্তি ও সম্ভবনা; ফার্মা কে.এল.এম; কলকাতা।

বিশ্বনাথ মুর্মু; ১৯৮৫, সাঁওতালি শব্দাবলি ও ভাষাশিক্ষা; ফার্মা কে.এল.এম; কলকাতা ।

মুহম্মদ আবদুল জলিল; ১৯৯১, বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি; বাংলা একাডেমী; ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম; ১৯৯৮, ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলি; বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; ১৯৯২, ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা; রূপা; রূপা সংস্করণ; কলকাতা।

সুবোধ ঘোষ; ২০০০, ভারতের আদিবাসী; ন্যাশনাল বুক এজেন্সী; কলকাতা।

সুহৃদকুমার ভৌমিক; ১৯৮৫,আদিবাসীদের ভাষা ও বাঙলা; ফার্মা কে. এল. এম; কলকাতা

Bodding P.O. 1929. Meterials for a Santali Grammar, Dumka;

Compbell A. 1941. Santali-English & English- Santali Dictionary; Calcutta.

Grierson. G.A. 1973. Linguistic Survey of India; Motilal Banarasidas; Delhi; R.P.

Qureshi, M.S. (ed.) 1984. Tribal Culture in Bangladesh; IBS, Rajshahi;